তারিখ 22 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

এ কে এম শাহনাওয়াজ

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিকে মানবিক করুন

দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার মৌসুম চলছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ হয়েছে, কোথাও চলছে এবং চলবে। এ অনেকটা বৈদিক যুগের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মতো। সেই অশ্বমেধযজ্ঞ, রাজসূয়যজ্ঞ যেমন। যজ্ঞ অনুষ্ঠান যেমন বৈদিক ব্রাহ্মণ আর রাজরাজড়াদের জন্য আনন্দের, তেমনি প্রজাসাধারণের জন্য আতংকের ছিল। সেই ডোবার ব্যাঙগুলোর মতো। বাচ্চারা ঢিল ছুড়ে আনন্দ খুঁজছে আর তাতে বিপন্ন হচ্ছে ব্যাঙদের জীবন। বৈদিক যুগের রাজারা এক-একটি যুদ্ধজয় আর বিশেষ উপলক্ষে বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং এর খরচ বহন করতে হতো সাধারণ মানুষের। নতুন নতুন করারোপ হতো। এতে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের জীবন। এ অসহায় মানুষদের বৈদিক রাজা ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে কী করে রক্ষা করা যায় এ ভেবে গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন নেপালের সামন্ত রাজার ছেলে গৌতম। এভাবেই তিনি সরল মানবিক দর্শন খুঁজে পেলেন। পরে যা বৌদ্ধধর্ম নামে প্রতিষ্ঠা পেল।

বৈদিক যুগের বিপন্ন মানুষ না হয় গৌতমবুদ্ধকে পেয়েছিল নিজেদের মুক্তির দূত হিসেবে। এ যুগের অসহায় অভিভাবক আর উচ্চশিক্ষাপ্রত্যাশীরা তো কোনো বুদ্ধের খোঁজ পাচ্ছেন না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশাসক অনেকেই বৈদিক ব্রাহ্মণের মতো। সাধারণ অভিভাবক আর শিক্ষার্থী যতই করুণ দশায় নিপতিত হোক না কেন, কল্পতরু আর সুবিধার বৃক্ষ থেকে নিচে নামব না। সাধারণ মানুষ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যতই চিৎকার করে গলা ফাটাক না কেন, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জাফর ইকবাল গৌতমবুদ্ধের মতো সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা যতই লিখুন না কেন, আমাদের অতিপ্রিয় ক্ষমতাবান সহকর্মীরা এর থেকে একচুলও নড়বেন না। তাদের তৈরি করা পদ্ধতির আওতায় তারা প্রতিটি পরীক্ষার্থীর নাড়ি টিপে টিপে যোগ্যজনকে খুঁজে বের করবেন। তারপর ছাত্রদের মেধার ওপর আস্থা রেখে নিজেদের অনেকে দেশজাতির কল্যাণ সাধনে গোষ্ঠী রাজনীতির কর্ষণে আত্মনিয়োগ করবেন। দিনের পর দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকবেন আর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নিজগুণে পড়াশোনা করে পরীক্ষার বৈতরণী পাড়ি দিয়ে চৌকস নাগরিক হবে।

ভর্তি পরীক্ষার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের পরিচিত লাইনটি বারবার মনে পড়ে। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।' যেখানে আমাদের ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ধারণ করতে হলে মাঝ সমুদ্রে নোঙর করা মাদারশিপের দরকার, সেখানে আমাদের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণক্ষমতা এক করলেও একটি ছোট ফিডার জাহাজ হবে না। এখন মেধা নয়— লটারির মতো হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ভর্তি পরীক্ষা। ১৯ নভেম্বর শুরু হয়েছে, শেষ হবে ২৪ নভেম্বর। সকাল ৯টায় শুরু হয়ে শেষ হচ্ছে সন্ধ্যায়। যেদিন ৭ শিফট সেদিন সন্ধ্যা পেরিয়ে যাচ্ছে। হাজারও ছাত্রছাত্রী আর অভিভাবকে ভরে গেছে বিশাল ক্যাম্পাস। ভোর ৬টায় হাঁটতে বেরোলে দেখছি, বাবা মেয়েকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ থেকে নাইট কোচে নেমেছেন। হাতে ব্যাগ। উদ্ভ্রান্ত চেহারা। নির্ঘুম রাত কেটেছে। মুখ ধোয়া, ফ্রেশ হওয়া ইত্যাদি নানা প্রয়োজন রয়েছে। আবার ছুটছেন কোন্ ভবনে কোন্ কক্ষে সিট পড়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য। প্রতিদিন হাজারও পরীক্ষার্থী ছুটছে স্রোতের মতো। ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত এ সংখ্যা কত সহস্র হবে কে জানে। আমরা তো পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিভাগ নিয়ে দুই হাজারের কম ভর্তি করতে পারব। একেবারেই লটারি। আরও একটি সংকট আছে।

এক পরিচিত অভিভাবক মেয়েকে নিয়ে এসেছেন পরীক্ষা দেয়াতে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। সব জায়গায় মেয়েকে নিয়ে ছুটেছেন বাবা। কোথাও ভাগ্যের শিকে ছিঁড়েনি। তবুও মেয়েটি হাল ছাড়তে রাজি নয়। জাহাঙ্গীরনগরে না হলে আবার ছুটবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অর্থাৎ অভিভাবক ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছুটছেন বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। অর্থ, শ্রম ও সময় সব বিসর্জন দিচ্ছেন। একটি সভ্য দেশে এমনটি হওয়ার কথা নয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক গুণ বেশি ভর্তির সুযোগ রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি কলেজগুলোতে। সেখানেও প্রতিযোগিতা খুব কম নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো এত ছোটাছুটি করতে হয় না। কিন্তু বাস্তবতা বুঝতে না পেরে অনেক ভর্তিযুদ্ধে নামা শিক্ষার্থী ভুল করে দু'কূলই হারায়। স্বাভাবিকভাবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী আশা করে, স্বপ্ন দেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বে। তাই অবহেলা করে কলেজের ফরম তোলে না। ফলে অনেকের ক্ষেত্রে সে সময়ও উতরে যায়। শেষ পর্যন্ত দু'কূল হারিয়ে হতাশায় নিপতিত হয়। তখন দরজা অবারিত থাকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর। এখানে অভিভাবকদের সাধ্যের প্রশ্ন রয়েছে। যাদের অগাধ সাধ্য, তারা প্রথম শ্রেণীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে না হয় ভর্তি করাতে পারে সন্তানকে; কিন্তু কম সাধ্যের অভিভাবক বাধ্য হন মাঝারি ও নিম্ন মাঝারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যেতে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশের লেখাপড়ার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তারপরও কী সবাই ঠাঁই পায়! অনেকেই হতাশ হয়ে শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়ে। এসব নিয়ে ভিন্ন আলোচনা অন্য একসময় হতে পারে। ভর্তি পরীক্ষায় ফরম তোলার যোগ্যতা যাদের আছে আমি বিশ্বাস করি, তাদের যে কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ দিলে সে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে পারবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দোকানের ঝাপ খুলে প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্র জেনে ভর্তি করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এর ভেতর বাস্তব চিন্তা যতটা না আছে তার চেয়ে বেশি আছে অমানবিক বাণিজ্য চিন্তা। আর শিক্ষাবিদের চেয়ে আমলা আর নেতা-মন্ত্রীদের বিবেচনার এক গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারিত হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। এখন শিক্ষার নীতিনির্ধারণে সবাই রাজা। তাই ইচ্ছামতো পাল্টে যাচ্ছে পরীক্ষা পদ্ধতি। প্রতিযোগিতা দিয়ে জিপিএ-৫ আর স্বর্ণখচিত পাঁচের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ক্লাস ফাইভের শিশুটিকেও ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষার ফাঁদে। আনন্দের সঙ্গে হেসে-খেলে তার যখন জীবন-জগৎ সম্পর্কে জেনে বড় হওয়ার কথা, তখন সে বিরস বদনে কোচিং করছে। গাইড ব্যবসায়ীরা এক গাল হেসে সরকারকে আশীর্বাদ করে শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছে গাইড বই। এ প্রশিক্ষণে আরও পাকা হয়ে ঢুকছে জেএসসি পরীক্ষায়। এভাবে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই উর্বর মেধাবী বিধায়কদের কল্যাণে যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর! সবার জানার জগৎ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। জিপিএ-৫ এখন জ্ঞানচর্চা থেকে বেরিয়ে এসে পারিবারিক ও ক্ষমতাসীনদের মর্যাদার প্রতীকে এসে দাঁড়িয়েছে।

> পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক গুণ বেশি ভর্তির সুযোগ রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি কলেজগুলোতে। সেখানেও প্রতিযোগিতা খুব কম নয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মতো এত ছোটাছুটি করতে হয় না। কিন্তু বাস্তবতা বুঝতে না পেরে অনেক ভর্তিযুদ্ধে নামা শিক্ষার্থী ভুল করে দু'কূলই হারায়। স্বাভাবিকভাবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী আশা করে, স্বপ্ন দেখে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বে। তাই অবহেলা করে কলেজের ফরম তোলে না। ফলে অনেকের ক্ষেত্রে সে সময়ও উতরে যায়। শেষ পর্যন্ত দু'কূল হারিয়ে হতাশায় নিপতিত হয়। তখন দরজা অবারিত থাকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর।

আমার এক সরকারি আমলা বন্ধু প্রশ্ন করেন, 'তোমরা এত কম পাস করাও কেন? দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় তিন চার ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।' আমি ওকে উল্টো বললাম, এর চেয়ে বেশি পাস করলে আমি বিস্মিত হতাম। বন্ধু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি ব্যাখ্যা করলাম। এখন জিপিএ-৫ পাওয়ার পরীক্ষায় বস্তা বোঝাই নম্বর পাওয়ার পদ্ধতি তৈরি করে দেয়া হয়েছে। এটি এমনই এক পদ্ধতি যে এর জন্য কোনো শিক্ষার্থীকে আর গোটা বই পড়তে হয় না। গাইড, নোট এবং মডেল টেস্টের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর স্বর্ণউদ্যানে পৌঁছা সম্ভব। চারপাশের জ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কিত করা আর সম্ভব হচ্ছে না। এরাই সমস্যায় পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় এসে। কারণ ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন করার সময় চেষ্টা করা হয় এইচএসসি পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থীর যা যা পড়ে আসার কথা, চারপাশের জীবন-জগৎ সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর রাখার কথা তা রেখেছে কিনা তা বাজিয়ে নেয়ার। অথচ অদ্ভুত বিজ্ঞজনদের কৃপায় আরোপিত পদ্ধতিতে চকচকে গ্রেডের নেশায় আমাদের মেধাবী সন্তানরা ওদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। ফলে চার-পাঁচ ভাগের বেশি শিক্ষার্থীর এই বৈতরণী পাড়ি দেয়া কঠিন। এ কারণেই বলি, প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীদের এক ধরনের বিকলাঙ্গ বানিয়ে দিচ্ছে।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাতেগোনা কয়েকটি আসনের বিপরীতে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ছুটে বেড়ানোর শাস্তি থেকে উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীয় পরিচালনায় একটিমাত্র পরীক্ষায় যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এখানেও কি চ্যালেঞ্জ নেই? বিগত বছরের মেডিকেল কলেজগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা নিতে গিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের কবলে পড়ে। সরকারিভাবে স্বীকার করা না হলেও ভুক্তভোগীরা জানে আসল সত্য কী ছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার আগে এসব সংকটের আশংকার বিষয়টি নজরে রেখে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে অহেতুক বিড়ম্বনার হাত থেকে হাজারও শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা রক্ষা পাবেন। শিক্ষকদের অনেক কর্মঘণ্টা বেঁচে যাবে। বেশ কয়েকদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ রাখার দায় থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধা সম্ভবত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারক মহল। এখানে নানা মত-পথের বিজ্ঞজনরা আছেন। কারও ইচ্ছে নিজেদের মতো করে পরীক্ষা নিয়ে যোগ্যকে খুঁজে বের করে নিজেদের ছোট্ট নৌকায় ঠাঁই দেবেন। কোনো পক্ষ মনে করে লম্বা করে পরীক্ষা নেয়ার একটি চাহিদা আছে শিক্ষকদের মধ্যে। কিন্তু অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা যে জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন এ বিষয়টি অনেকে বিবেচনায় আনছেন না। প্রশ্ন থাকে এমন রেডিমেড চৌকস ছাত্রের দরকার কী। আমাদেরই তো দায়িত্ব ওদের পড়িয়ে চৌকস করে গড়ে তোলার।

আমার মনে হয়, বর্তমান ধারার ভর্তি পরীক্ষা এখন জাতীয় সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সবারই আরও সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন। এ বাস্তবতায় আরও উত্তম কোনো প্রস্তাব থাকলে তা নিয়েও ভাবা যেতে পারে। তবুও এ অমানবিক ভর্তি পরীক্ষা থেকে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের যেন মুক্তি দিতে পারি।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com